স্থান-কাল-পাত্র

লুব্ধক

কোথা দিয়ে শুরু করব, কিভাবে শুরু করব এবং শুরু যদিবা করি তার পরে কি লিখব, ঠিক দোটানা নয়, এরকম একটা তে-টানার মধ্যে পড়ে আমার কলম আজ খাবিখাই করছে। নাকি আমি নিজেই খাবিখাই করছি—ঠিক বুঝতে পারছি না—কেননা খাবিখাই করা লোক কি নিজে বুঝতে পারে যে, সে খাবিখাই করছে। কিন্তু এত ভূমিকা টেনে কি পার পাওয়া যাবে, আসল বিষয়ে এক সময়ে যেতেই হবে এবং তখন থলে থেকে বিড়ালটা বেরিয়ে আসবে—বেরিয়ে আসতে হবেই। যাহোক এবারে শিক্ষা বিভাগের থলে থেকে গ্রাজুয়েশনের ফলাফলরূপী যে বিড়ালটা বেরিয়েছে, তার রঙ কালো না ধলা? ঠিক বুঝা যাচ্ছে না। কেননা, চারদিকে যে রকম ধুম-ধাড়াক্কা,—কালা-ধলা সব একাকার হওয়ার যোগাড়। সুতরাং খামুশ থাকাই উত্তম।

আগের দিন হলে স্রেফ এক কথায় বলে দেওয়া যেত কর্তৃপক্ষ শিক্ষা সংকোচন নীতি গ্রহণ করেছেন। ফলে এদেশের ছেলেরা লেখাপড়া শিখুক, লেখাপড়া শিখে বিদ্বান হোক, উচ্চশিক্ষা নিয়ে দেশে-বিদেশে বিভিন্ন পদে ও মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়ে নিজেদের যোগ্যতা ও দক্ষতার প্রমাণ দিক, এটা কেউ চাইছেন না। ফলেই ফেলের হার এত বেশী। কিন্তু অধুনা সে অপবাদ আর যারই দেওয়া যাক, সরকারকে দেওয়া যাবে না। কেননা দেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্য সরকারী প্রয়াস প্রচেষ্টা মোটেও কম নয়। তাছাড়া আমরা সবাই জানি, বেসরকারী কলেজের শিক্ষকবৃন্দও যথারীতি সরকারী ভাতা ইত্যাদি পেয়ে থাকেন। ওইসব কলেজকে সরকারীভাবে অনুমোদন বা স্বীকৃতিও দেওয়া হয়ে থাকে। ওইসব কলেজ দেখাশুনা করার জন্য যথারীতি পরিদর্শকও রয়েছেন। কলেজ যখন, তখন প্রিন্সিপ্যাল-প্রফেসার—তারও কমতি থাকার কথা নয়। দেশের এমন কোন কাজের প্রতিই সরকারের অমনোযোগ নাই। পারলে সব স্কুল-কলেজকেই তারা সরকারী স্কুল-কলেজ বানাবার জন্যে প্রস্তুত। শুধু ঘোষণা দেওয়া মাত্র বাকী।

অবশ্য আগেকার দিনে সেই ঔপনিবেশিক আমলে, সরকারী স্কুল-কলেজের চেয়ে বেসরকারী স্কুল কলেজের কদর ছিল অনেক বেশী। আমরা কারমাইকেল কলেজে যখন পড়তাম,—ঘুণাক্ষরেও কোনদিন মনে হয় নাই সরকারী কলেজে পড়ছি না বেসরকারী কলেজে। শুধু জানতাম, আমরা এমন এক কলেজের ছাত্র যার জায়গা-জমির পরিমাণ নয়শো বিঘা; কেবল ঢাকা হাইকোর্ট বিল্ডিং যার বিল্ডিং এর সাথে তুলনীয় হতে পারে; যার গর্বের ইতিহাস আছে আর আছে গৌরবময় ঐতিহ্য।

অনেক পরে কারমাইকেল কলেজ সরকারী কলেজে পরিণত হয়। এইমাত্র সেদিন শামসুল হুদা ভাই এসেছিলেন—আমাদের সময়ে তিনি ছিলেন কলেজ ইউনিয়নের জি, এস,—বললেন, ব্যারিষ্টার সাহেবকে রংপুরে নিয়ে গিয়ে কলেজটা দেখাতে নিলাম। কলেজ বিল্ডিং-এর দুরবস্থা দেখে কান্না পাচ্ছিল। কি আলীশান ভবন, আর তার এখন কি দুর্দশা।

এতকিছু থাকতে হুদা ভাই কেন যে বেছে বেছে কলেজ ভবনের কথা বলেছিলেন, সেদিনও বুঝতে পারি নাই, আজো পারছি না। তাছাড়া আমাদের অফিসে রক্ষিত রেফারেন্স বিভাগের ফাইল ঘেঁটেও দেখলাম, সর্বত্রই মফস্বলের বিভিন্ন কলেজের দুরবস্থার কাহিনী। কোনটার ছাদ দিয়ে পানি পড়ে। কোনটাতে ঠিকমত শিক্ষক নাই। কোনটাতে শিক্ষকেরা বছরের পর বছর ধরে বেতন পান না। বুঝতে পারি না, সাংবাদিকদের কি খেয়ে-দেয়ে আর কোন কাজ নাই,—বেছে বেছে ভাঙ্গা কলেজ, ভাঙ্গা ছাদ, ভাঙ্গা টেবিল-চেয়ার দেখে বেড়ানো ছাড়া? কোন কোন দুর্মুখ আবার এ পর্যন্ত বলেছেন, পড়াশুনা লাঠে উঠেছে। অবশ্য একটিমাত্র বিষয়ে সব কলেজই নাকি চাঙ্গা। তা হল পলিটিক্স। না, আমরা ছাত্র পলিটিক্স-এর বিরোধী নই। আগেকার দিনেও ছাত্রেরা পলিটিক্স করতেন। সেই ট্রাডিশন এখনো চলছে, এবং তা চলবেই, কেউ ঠেকাতে পারবে না। কিন্তু তাই বলে এ কথা কি বলা ঠিক যে, ইদানীং কলেজগুলিতে সব হয়, শুধু লেখাপড়াটা ছাড়া। না, এ কথা বলা মোটেও ঠিক না। তাছাড়া ভার্সিটিগুলির কথা এই মুহূর্তে বলতেও চাই না। এদেশে কারো ঘাড়েই দু'টা মাথা নাই।

সুতরাং বি, এ পরীক্ষায় পাসের হার শতকরা ১৭ নিয়ে হায়মাতম যাঁরা করছেন, আমি তাঁদের দলে নই। গতবারে ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষার এমনিতর রেজাল্ট নিয়ে এই কলামে লিখেছিলাম, আমার লেখায় কোন ইঙ্গিত ছিল কিনা, বলতে পারব না, কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে প্রতিবাদ করা হয়েছিল, না, ইচ্ছাকৃতভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের কম নম্বর দেওয়া হয় নাই। তারা পাস করতে পারে নাই, তাই ফেল করেছে। এবারে এই বি, এ পরীক্ষার ব্যাপারেও সেই কথাই। সুতরাং মেনে নিচ্ছি। গত '৮৩ সালের জানুয়ারী মাসে বেরিয়েছিল '৮২ সালের বি,এস-সি ও বি, কম পাস ও সাবসিডিয়ারী পরীক্ষার ফলাফল। বি, এস-সিতে পাসের হার ছিল শতকরা ১৪'৭। বি, কম-এ ১০'৬। সাবসিডিয়ারীতে বি, এস-সি শতকরা ৩৯'৫৮; বি, কম ২৩'৩৭। সাবসিডিয়ারীটা তো হয় অনার্সের সাথে। দেশের কতজন ছেলে-মেয়ে অনার্স পড়ার সুযোগ পায়, এবং কতজন শহরে থেকে অনার্স পড়ার মত সঙ্গতি রাখে, সে প্রশ্ন তোলারও সাহস আমার নাই। আমি শুধু এইটুকু বলার সাহস দেখাতে পারি যে, পাস-কোর্সে বি,এ হোক, বিএ-সসি হোক অথবা বি, কমই হোক, এই শতকরা ২০-এর নিচে পাসের পারসেণ্টেজ দিয়ে আমরা দেশের ভবিষ্যৎ সুউজ্জ্বল করে গড়ে নিতে বদ্ধপরিকর। এ বিষয়ে যারা সন্দিহান, তারা শুধু পাকিস্তানী আমলের দালাল নয়, দেশ এবং জাতিরও শত্রু।

না, এই মুহূর্তে আমার কোন প্রশ্ন নাই শিক্ষা বিভাগের প্রতি, কিংবা কোন কলেজ কর্তৃপক্ষের প্রতিও। এই পর্যায়ে কানে কানে একটা সত্য কথা বলি, এদেশে এখন, এই মুহূর্তে এমন বোকা লোক খুব কমই রয়েছেন, যিনি প্রকাশ্যে উঁচু গলায় বলতে পারবেন যে, তাঁর কিছু প্রশ্ন রয়েছে, যদিও সে সব কেবল ছাত্র পড়ুয়াদের প্রতি কিংবা শুধু কলেজ শিক্ষকদের প্রতি নয়। সেই যে কবি অনেক আগে একটা ছত্র লিখে সবাইকে তরিয়ে দিয়ে গেছেন,—"কার নিন্দা করো তুমি মাথা করো নত, এ আমার এ তোমার পাপ,—সেই ছত্রটি মুখে মুখে আওড়ে সুতরাং কানকথা বাদ দিয়ে বুদ্ধিমান সেজে চুপ থাকাই ভাল। এখনো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক ২১শে ফেব্রুয়ারী উদযাপন করতে গিয়ে স্রেফ নিজস্ব বোকামির দরুন মেডিকাল কলেজ হাসপাতালেই পড়ে রয়েছেন। এ দেশের কোন হাসপাতালেই বেডের সংখ্যা বেশী নয়।

এবারে সুতরাং কি বলা উচিত হবে, বলার আগে তা অবশ্যই ভেবে নিতে চাই। বলব কি যে, কি বিচিত্র এই দেশ সেলুকাস? না, এতবার এই কথাটা এদেশে উচ্চারিত হয়েছে যে, এর ধার এবং ভার দুটাই ক্ষয়ে গেছে। সেই যে আগেকার দিনে লেখাপড়া শিখতে না চাওয়া লোকদের নামে যে ছড়াটা চালু ছিল—সেটা উদ্ধৃত করেই কি তাহলে বলে দেওয়া ভাল যে, "লিখিব, পড়িব, মরিব দুঃখে/মৎস্য ধরিব খাইব সুখে?" হায়, এদেশে এখন সেই মাছেরও এত আকাল যে, খোদ মৎস্যজীবীরাই মাছ ধরার কাজ ছেড়ে অন্য পেশায় পলায়ন করছেন। তাহলে? তাহলে কি সেই পাকিস্তানী আমলের বহু কথিত ইণ্ডিয়ান দলিলের জের টেনে বলব, তাদের একটা প্ল্যান ছিল যে, সেখানে তারা মুসলিম ছেলেদের উচ্চ শিক্ষার দ্বার রুদ্ধ করে রাখবে। শতকরা ২০ জনের বেশী কোন মুসলিম তরুণ ইণ্টারমিডিয়েট বা গ্রাজুয়েশন ডিগ্রি পাবে না। মুসলিম মেয়েদের বেলায় কিন্তু এর ব্যতিক্রম হবে। তারা শয়ে শয়ে পাস করবে ইণ্টারমিডিয়েট ও গ্রাজুয়েশন। দল বেঁধে অনার্স এবং এম,এ ক্লাসে ভর্তি হবে। পাসও করবে। কিন্তু পাস করার পর আর বিয়ে করার মত মুসলিম গ্রাজুয়েট বা এম,এ ছেলে খুঁজে পাবে না। তখন বিয়ে করতেই হবে তাদের অন্য সম্প্রদায়ের গ্রাজুয়েট বা এম,এ পাস যুবকদের।?

বলা অনাবশ্যক যে, এভাবেই ইণ্ডিয়ান দলিলের সূত্র টেনে—সেই পাকিস্তানী চক্রান্তকারীরা জনসাধারণকে ভাঁওতা দিত। বলত, যাদের ইচ্ছা তারা ইণ্ডিয়া গিয়ে দেখে আসুক, সেখানে উচ্চ শিক্ষার স্তরে মুসলিম মেয়েদের সংখ্যা মুসলিম ছেলেদের চেয়ে কতগুণ বেশী।' পাকিস্তানী কর্মকর্তারা জানতেন, ইণ্ডিয়া যাওয়া সহজ নয়। কোন রকমে যাওয়া গেলেও সহজ নয় ওই তুলনামূলক হিসাব বের করা। পাকিস্তানী বিদ্বেষপরায়ণ আমলারা সেকালে এই মর্মেও নাকি প্রচারণা চালাতেন যে, প্রাপ্ত ইণ্ডিয়া দলিলে নাকি এও ছিল যে, ভারতীয় মুসলিম তরুণদের ম্যাট্রিক লেভেল থেকেই নানান ধরনের টেকনিক্যাল কাজের দিকে ঝুঁকে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। যাতে করে শিক্ষিত মুসলিম তরুণেরা আবশ্যিকভাবে লোহালক্কড়ের মিস্ত্রি, কারিগর, টেকনিশিয়ান হয়ে পড়ে। কর্মকর্তাদের অভিপ্রায়, মুসলিম গ্রাজুয়েট ও এম, এ পাস তরুণীরা আর যাই করুক ম্যাট্রিক বা ইণ্টারমিডিয়েট মিস্ত্রি-কারিগরদের স্বামী হিসাবে গ্রহণ করবে না। ইত্যাদি ইত্যাদি।

সত্যি, পাকিস্তানী বিদ্বেষপরায়ণ, ষড়যন্ত্রকারী ও চক্রান্তে পারঙ্গম আমলা শাসকদের এই ধরনের বানোয়াট প্রচারণা ও মিথ্যা প্রোপাগাণ্ডা বিশ্বাস করতেও লজ্জা পেতে হয়। আর যদি সব ধরনের লাজ-শরমের মাথা খেয়ে ক্ষণকালের জন্য বিশ্বাসও করে নেই যে, প্রাপ্ত ভারতীয় দলিলে ওইরকম একটা প্ল্যান-প্রোগ্রাম রয়েছে কিংবা ছিল, তাহলে স্বীকার করতেও দ্বিধা বা কুণ্ঠা থাকার কথা নয় যে, তারা ওই প্ল্যান-প্রোগ্রাম নিয়েছে বা নিয়েছিল তাদের বৃহত্তর সামাজিক ও সাম্প্রদায়িক ঐক্য ও সংহতি বিধানের জন্যই। এবং তাদের তরফ থেকে এতে দোষের কিছুই নাই। কিন্তু আসলে যা সত্য নয়, তাকে ক্ষণকালের জন্যেও সত্য বলে মেনে নিয়ে কোন সিদ্ধান্ত টানাও ঠিক নয়। তাছাড়া ভারত যাই করুক, সেটা তাদের নিজেদের ব্যাপার।

কিন্তু তবুও প্রশ্ন থাকে। সে আমলে পাকিস্তানীরা এইসব প্রচার-প্রোপাগাণ্ডা চালিয়ে আমাদের কি বুঝাতে চাইত? বুঝাতে চাইত যে, বাঙ্গালী মুসলমানদের বেশী করে লেখাপড়া করাটা ঠিক নয়। টেনেটুনে ম্যাট্রিক, বড় জোর ইণ্টারমিডিয়েট—তারপর যে যার পেশা ধরাই উত্তম,—হালের ছেলে হালে যাক, জালের ছেলে জালে। তারা আরো বুঝাতে চাইত যে, বেশী করে বি, এ পাস করলে বেশী করে ছেলে আসবে ইউনিভার্সিটিতে। তাহলে হুড়-হাঙ্গামা হবে বেশী। পলিটিকসে তাদের বেশী করে পলিউটেড করার মওকা পাবে অগুরা। দেশটা গোল্লায় যাবে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

প্রশ্ন উঠতে পারে, আজ লিখতে বসে কেন পাকিস্তানী আমলের সেই বস্তাপচা প্রচার-প্রোপাগাণ্ডার কথা টেনে আনছি? টেনে আনছি এ কারণে যে, এদেশে এখনো পাকিস্তানী মানসিকতার লোক প্রচুর আছে। তারা আবার ভেবে না বসে যে, এদেশে কোন-না-কোনভাবে ইণ্ডিয়ার সেই দলিলের প্লান-প্রোগ্রামটাই কার্যকর হচ্ছে বা হতে যাচ্ছে। আসলে, ভুয়া প্রচারণার মূল্য কানা কড়িও নাই। বাস্তবেও দেখা যাবে, ছেলেদের যদি আজ বলা হয়, "বাবারা লেখাপড়ার দিকে মনোযোগ দাও।" হাজারটা অজুহাত শুনতে হবে। রাগী তরুণদের হাজারটা কৈফিয়তের জওয়াব দিতে জান বেরিয়ে যাবে। আর ওরই মধ্যে যারা একটু বেশী রাগচটা (বদরাগী শব্দটা যে ইচ্ছা করেই ব্যবহার করছি না—সেটা মনে রাখতে হবে) তারা চেইন, হকিষ্টিক ইত্যাদি নিয়ে হয়ত তেড়েই আসবে।

কিংবা ধরুন, শিক্ষকদেরই যদি বলি,—মহোদয়বৃন্দ, একটু ভালমত ছেলেদের লেখাপড়া শেখান,—সারাটা বছর পড়াশুনা করে আমাদের অভাবী সংসারের ছেলেগুলি যে এভাবে ফেলটু শেখ হয়ে বসে থাকবে, সেটাইবা কেমন কথা? নিশ্চিত বলতে পারি, কথাটা মাটিতে পড়ার অবকাশ পাবে না, কলেজের শিক্ষকবৃন্দ রে রে করে তেড়ে আসবেন। চাই কি সরকারী কিংবা বেসরকারী কলেজের শিক্ষক সমিতির তরফ থেকে কড়া প্রতিবাদ আসবে। বলা হবে, বেতন কম, ভাতা কম, শুধু কম নয়, ইররেগুলার এবং ইররাশনাল। ওই যে শতকরা ১৭ জন পাস করেছে, ওটাই এ দেশের বাপের ভাগ্য। একটাও যদি পাস না করত, যেমন অনেক কলেজেই করে নাই,—তাহলেও কিন্তু এসব কথা এভাবে বলার অধিকার কারো নাই, থাকতে পারে না।

এবারে বাকী থাকে শুধু শিক্ষা বিভাগ, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়—এবং শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দফতর ও পরিদফতর। কিন্তু তাদের কি বলা যাবে? শিক্ষার সর্বোচ্চ পর্যায়ে তারাই দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। গোটা দেশকে যারা শিক্ষা দেওয়ার জন্য (মাফ করবেন শিক্ষা দেওয়াটা এক্ষেত্রে শিক্ষা প্রদান অর্থে—এক হাত দেখে নেওয়ার অর্থে অবশ্যই নয়) এক পায়ে খাড়া, তাদের কাছে শিক্ষা সম্পর্কে কোনকিছু বলা—মায়ের কাছে মামা বাড়ীর গল্প বলার মত নয় কি?

সুতরাং এবারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ ফেল করা শিক্ষার্থীর শতকরা ৮৩ জন পিতা-মাতা ও অভিভাবকের নিকট বক্তব্য পেশ করা ছাড়া গত্যন্তর কোথায়? জানি, এঁরা অনেকে হালের গরু বিক্রি করে, জমি বন্ধক রেখে, মায়ের গহনা বেচে ছেলে-মেয়েদের লেখা-পড়ার খরচ যুগিয়েছেন। এও জানি, এঁরা অনেকেই আশা করেছিলেন, ছেলে পাস করবে, হয় এম, এ পড়বে না হয় চাকুরী করে তাঁদের অভাবের সংসারে সাহায্য করবে। কিন্তু সে আশা তাঁদের পূরণ হল না। হবে কেমন করে? এই শতকরা ৮৩ জন অর্থাৎ কুল্লে বেশী নয় প্রায় সাড়ে সাত হাজারটি ফ্যামিলি নিজেদের কৃতকর্মের গুনাগারী দিল মাত্র। কেননা লেখাপড়ায় না দিয়ে ছেলেটিকে যদি তাঁরা চাষাবাদের কাজে লাগাতেন, ছেলের রোজগার খেয়েই তাহলে অনেক মা বাবা আরামে চোখ মুদতে পারতেন। এখন ফেল করা ছেলে না পাবে চাকুরী, না করতে পারবে হাল-গেরস্তি কিংবা অন্যকিছু। হওয়ার মধ্যে কেউ হবে টাউট-টেণ্ডল, কেউ বখে গিয়ে ভিন্ন পথ ধরবে। কেউবা এ দেশের আর দশজন শিক্ষিত-আধাশিক্ষিত বেকারের মতই 'শুধু দিন যাপনের শুধু প্রাণ ধারণের গ্লানি' বহন করে বেড়াবে। এভাবে বৃটিশ আমলের দুই শতাব্দী কেটেছে। এভাবেই কেটেছে পাকিস্তানের সিকি শতাব্দী। আর এভাবে কেটে যাচ্ছে এবং যাবে বাংলাদেশের এক যুগ এবং আসছে যুগগুলি। অন্যথা হবে কেন? এটাই এই দেশের—এই দেশবাসীর ইতিহাস এবং ঐতিহ্য। দেশবাসী কি এমন অপরাধ করেছে যে, তাদের চিরায়ত ঐতিহ্য ভূলুণ্ঠিত হবে?

সুতরাং এই কলামে দেশের শিক্ষাকে বাস্তবমুখী এবং বেকারত্বের অভিশাপ ঘুচাবার জন্য ইতিপূর্বে যে প্ল্যান-প্রোগ্রাম পেশ করেছিলাম, এতদ্বারা তা আমি উইথড্র করে নিচ্ছি। কেনন', ভয় হয়, পাছে আমাকে কেউ ভুল বুঝেন। মনে করেন, চিরাচরিতের মাঝখানে আমি একাই কেন শিক্ষা ব্যবস্থার সুরাহা বুঝতে পারার বাহাদুরি নিতে চাইছি। নিশ্চয়ই আমার কোন মতলব আছে এবং সেই মতলব কস্মিন কালেও দেশ ও জাতির স্বার্থে সহায়ক নয়। হতেই পারে না।

অতএব যাঁরা এবারের বি, এ পরীক্ষায় পাস করেছেন, তাঁদের প্রতি দুঃখ ও সমবেদনা জানি (কেননা পাস করার পরে তাদের বেশীরভাগই না হতে পারবেন কোথাও ভর্তি; পাবেন কোন চাকুরী) এ যাঁরা ফেল করেছেন, তাঁদের প্রতি অভিনন্দন জ্ঞাপন ক (কেননা পাস করাদের তাঁদের আর অত বেশী ছুটা করতে হবে না, হতাশও হ হবে না) এই লেখাটা করছি। ইতি। অলমিতি বিস্তরে